অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণ

টাঙন-তীরের বেশির ভাগ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী। বৃহত্তর বাঙালি হিন্দু সমাজের যেসব পুজো ও পালাপার্বণ আছে, সেগুলি এ অঞ্চলে পালন করতে দেখা যায়। যেমন- দুর্গাপুজো, কালীপুজো (কোজাগরি পূর্ণিমার পরের অমাবস্যা), লক্ষ্মীপুজো, বিশ্বকর্মাপুজো, গণেশপুজো, সরস্বতীপুজো ও কোথাও কোথাও বাসন্তীপুজো । তবে প্রথাগত এই পুজোপার্বণের বাইরেও সারা বছরই স্থানীয়ভাবে লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানের বহর দেখা যায়।

কালীপুজো:

এ অঞ্চলের বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এঁদের নিজস্ব পরম্পরা ও সংস্কৃতি অনুসারে বছরের বিভিন্ন সময়ে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। রাজবংশি ও পলিয়া সম্প্রদায় অঘ্রানের নবান্ন উৎসবের আগে কালীপুজো করে থাকেন। বছরের সুবিধেজনক সময়ে রাজবংশি সম্প্রদায় গ্রাম-কালীপুজো করেন। মঙ্গলসূচক কাজ করার আগে কালীপুজো সম্পন্ন করা অনেক পরিবারের একটি প্রচলিত প্রথা।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কালীপুজোর প্রচলন আছে। কালীপুজো এই অঞ্চলকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সাঁওতাল, মুন্ডা,

ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এই পুজো করেন। অনেক গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরাও কালীপুজো করে থাকেন। গাজোলের দেওতলা ও গোবিন্দপুরে চিরাচরিতভাবে দেবীকালী পূজিতা হচ্ছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে। তবে দীপাবলির রাতেও রাজবংশি সম্প্রদায় 'গছা দেওয়া' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কালীপুজোয় মেতে ওঠেন। তাঁরা বাস্তুঠাকুরের থান, ঘরের দরজা ও দেবস্থানে কলাগাছ পুঁতে অধিকারীকে দিয়ে পুজো করান। সেখানে সারা রাত প্রদীপ জ্বলে। পরের দিন খুব ভোরে কলাগাছগুলিকে পুকুরে ফেলে দেন তাঁরা।

মনসাপুজো :

এ অঞ্চলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনসাপুজো । এই পুজোর সঙ্গে সর্পভয়ের সম্পর্ক আছে। এই এলাকার উচ্চবর্ণের হিন্দু থেকে অন্ত্যজ সম্প্রদায় সবার ঘরেই মনসা পূজিতা হন। মনসাপুজোকে কেন্দ্র করে নানা লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার ও গল্প-গাথার প্রচলন আছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সতী বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে নদীপথে ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন। সেই বেহুলা নদীর অবস্থান টাঙন নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত। টাঙন নদীর সঙ্গে বেহুলা নদী মিশেছে হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীতে। দুই নদী মিলনের ফলে মনসামঙ্গল গান ও মনসাপুজো এখানকার জনপদের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। গাজোল, হবিবপুর, পুরাতন মালদহ ও বামনগোলার বিভিন্ন গ্রামে মনসাগানের ব্যাপক প্রচলন আছে।

মঙ্গলচণ্ডীপুজো :

টাঙন তীরের অন্যতম পার্বণ মঙ্গলচণ্ডীব্রত। শুধু গ্রাম্য মহিলারই নন, শহর-ঘেঁষা জনপদের বহু পরিবারের শিক্ষিত মহিলারা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করে থাকেন। গৃহবধূদের পাশাপাশি স্কুল-কলেজপড়ুয়া মেয়েরাও এই ব্রতে শামিল হন। সাধারণত বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবার উপোসি থেকে দুপুরে বা বিকেলে বা সন্ধ্যায় চণ্ডীপুজো করেন তাঁরা। মহিলারা নিজেরাই এই পুজো করেন। তবে আজকাল ব্রতকথা হিসাবে অনেকেই কালকেতু বা ধনপতি সওদাগরের কাহিনিটি গদ্যাকারে পাঠ করেন।

টাঙন-তীরের রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাপক প্রভাব আছে। একসময় এখানকার গৃহস্থ বাড়ির বার্ষিক মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান হিসাবে চণ্ডীপুজো করা হত। আজও কোনও কোনও রাজবংশি পরিবার অন্নপ্রাশন, বিয়ের মতো শুভানুষ্ঠান মঙ্গলচণ্ডীর পুজো ছাড়া ভাবতেই পারেন না। মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল এই অঞ্চলে বিশেষভাবে সমাদৃত। চণ্ডীমঙ্গলের অষ্টমঙ্গলাগানে মোট ষোলোটি পালা গাওয়া হয়।

গম্ভীরাপুজো :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের শিবের বিশেষ আরাধনা গম্ভীরা নামে পরিচিত। গম্ভীরাকে কেন্দ্র করে পুজো-উৎসব-মেলা-পার্বণের চল রাজবংশি সম্প্রদায়েরর মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই পুজোকে ঘিরে গাজন মেলা ও চড়ক

মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চড়কে সাধারণত ধানুক সম্প্রদায়ের লোকেরা পিঠে বড়শি ফুঁড়ে চড়কদণ্ডের মাথায় ঘোরেন। অত্যন্ত কষ্টকর এই অনুষ্ঠান। প্রায় একমাস ধরে ঘরোয়া পুজোপার্বণের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করেন। গম্ভীরার পুরনো আঙ্গিক হিসেবে প্রথম দিন ঘট ভরা, দ্বিতীয় দিন ছোটো তামাশা, তৃতীয় দিন বড় তামাশা, চতুর্থ দিন মশান নাচ আজও লক্ষ করা যায়। মশান নাচের সময় ঢাকের সঙ্গে কালীমুখোশ পরিহিত ভক্ত ধূপচির ধোঁয়া নিতে মেতে ওঠেন। পরে সেই ভক্ত টাঙনের জলে স্নান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটান।

অন্যান্য হিন্দুব্রত :

পলিয়া রাজবংশি চাঁই ও ধানুক সমাজের মধ্যে কোথাও কোথাও রথাই ব্রতের প্রচলন আছে। আলপনা-আঁকা একটি রথের কাছে মনস্কামনা পূরণের জন্য মহিলারা মানত করেন।

রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে চাষের জমিতে গিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে 'আকলাই নেওয়া' অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। নতুন ধান ওঠার এই হৈমন্তিক উৎসবের পরেই তাঁরা নবান্ন পালন করেন। আকলাই নেওয়ার সময় কয়েকটি ধানের শিষ কাস্তে-সহ কলার পাতায় মুড়িয়ে বাড়িতে এনে গোলাঘরে রাখা হয়। পাকুয়ার ঈশ্বরপাড়ায় নবান্নের দিন হিন্দু আচার অনুযায়ী আমগাছের নিচে গ্রামের লোকেরা পুজো করেন। একই সঙ্গে তাঁরা পিরের থানে শিন্নি উৎসর্গ করেন।

বেশি ফসলের আশায় ও অপদেবতার প্রকোপ থেকে শস্যকে রক্ষা করতে রাজবংশি সম্প্রদায়ের লোকেরা 'লখিডাক' অনুষ্ঠান পালন করেন। আশ্বিনের সংক্রান্তির সন্ধ্যায় তাঁরা পাটকাঠি জ্বালিয়ে চাষের ক্ষেতে ঘোরেন আর ছড়ার মতো করে আগুনের কাছে বেশি ফসল পাওয়ার কামনা করেন।

চাঁই সমাজের মধ্যে আশ্বিন মাসে জিতাষ্টমী ব্রত, হোলির দিন ডোরাবাঁধা অনুষ্ঠান, কার্তিক মাসের কালীপুজোয় উল্কা উৎসব, পৌষসংক্রান্তিতে সোনারায়ের পুজো, দোলপূর্ণিমার ভোরে আগজি পুজো, অঘ্রান মাসে জঙ্গলথাসা অনুষ্ঠান দেখা যায়। তবে এই জনপদের চাঁই সমাজের মধ্যে পাঁচ পিরকে বাস্তুদেবতা হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়।[১] বৈশাখ মাসে বেশির ভাগ চাঁই পরিবারে সত্যনারায়ণপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুরের পুজো উপলক্ষে সমবেত ধর্মীয় আচার পালনের চল দেখা যায়। হবিবপুরের নদীতীরবর্তী এই সম্প্রদায়ের মানুষ আলই ব্রত ও কুমিরপুজো করেন। পৌষ জুড়ে আলইগানের পর সংক্রান্তিতে কুমিরপুজোর চল আছে তাঁদের মধ্যে।[২]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাস। এঁদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আধিক্য। বাদনা বা সোহোরায় (সহরায়) সাঁওতালদের মুখ্য অনুষ্ঠান। চাষবাসে গবাদি পশুকে বিশেষ যত্ন ও গুরুত্ব

দিতে এই উৎসবের উদ্ভব হয় বলে আদিবাসীদের বিশ্বাস। সাধারণত মাঘীপূর্ণিমায় পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব চলে। বাঙালিদের দুর্গাপুজোর মতো বাদনা উৎসবের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা হয়, দেওয়াল নিকানো হয়। বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়িতে আসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

পাঁচদিন ধরে চলতে থাকা, উৎসবের প্রথম দিনকে বলা হয় 'উম'। ওইদিন দুজন জগমাঝি মাদলের তালে গেয়ে চলেন গরু-মোষের বন্দনা। তবে পুজোর উপকরণ হিসাবে নতুন কুলো, ধূপ, সিঁদুর, আতপচাল, দূর্বা, কলা, বাতাসা, পচই, মুরগি ও পায়রা একত্র করা হয়। সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত ভোজ বাদনা পরবের অপরিহার্য অঙ্গ। আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে দ্বিতীয় দিন 'দাকা' উৎসবে মিলিত হন সাঁওতালেরা। উৎসবের তৃতীয় দিন 'ঘুন্টা'ও যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ থাকে। এ দিন আদিবাসী-গৃহস্থেরা তাঁদের সাজানো- গোছানো ঘরের সামনে খুঁটিতে গরু-মোষ বেঁধে রাখেন।

বাদনা পরবের চতুর্থ দিনে টামাক, বাদল ও ঝাঁঝর বাজিয়ে চলে সমবেত নাচগান। এই দিনকে তারা 'জালে' বলে। পঞ্চম দিনকে তারা 'হাকোঃ-কাটোকম' বলে থাকেন। এই দিন তাঁরা দেবতার কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন।

সাঁওতাল ছাড়াও মুণ্ডা, কোড়া, লোধা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসবের চল আছে। তবে তাঁরা কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিন থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু করেন। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে লক্ষ্মী বা ভগবতী নামে তাঁরা পুজো দেন। তবে আঙ্গিকের ভিন্নতা থাকলেও এই পার্বণের মূল সুর একই— গবাদি পশুর সুরক্ষা।

'বাহা' সাঁওতালদের আরেক সৃষ্টিশীল পার্বণ। গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা ও পুরাতন মালদহ ব্লকের প্রায় প্রতিটি আদিবাসী গ্রামেই এই উৎসব পালিত হয়। ফাল্গুনের শুক্লা-দ্বাদশী থেকে বাহা পরবের শুরু। চলে দু'দিন ধরে। মূলত বনজসম্পদ সংরক্ষণের তাগিদে এই পার্বণের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন জাহের থানে দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করেন পুরোহিত। এই উৎসবে পুরনো রীতির গান গাওয়া হয়। পুজোর উপকরণের সঙ্গে ডালায় সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন অস্ত্রে সিঁদুর মাখানো হয়। মূলত তিন দেবতাকে এই পুজোর নৈবেদ্য দেওয়া হয়— পঞ্চদেবতা (মেড়ে কো), জাহের এরা ও মারাং বুরু।

পুজোর পরে শিকারের মৃত পশুপাখির মাংস দিয়ে প্রস্তুত হওয়া খিচুড়ি বিতরিত হয় প্রসাদ হিসেবে। বাদনার মতো এই পুজোতেও সমবেত নাচগানের চল আছে। ঋতুরাজ বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রাতে মাদলের তালে সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা বাহায় মেতে ওঠেন। এই উৎসব শেষ হলে মহুয়া ফুল ও শালের ফুল তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন।

বাহা ও বাদনা ছাড়াও আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন পার্বণের চল আছে। ভালো ফসলের কামনা করে আষাঢ় মাসে বিভিন্ন দেবতাকে মুরগি উৎসর্গ করে 'এরক-সিম' উৎসব পালন করা হয়। একই ভাবে বীজ বোনার পর 'হাঁড়িয়ার-সিম' ও ফসল কাটার সময় 'জানথাড়' উৎসব পালিত হয়। পৌষ মাসে মারাং বুরুর পুজোর মধ্য দিয়ে 'সাকারাত' উৎসব। বৈশাখ মাসে বলি ও জাদুবিদ্যার মাধ্যমে 'মাকড় মে' উৎসব পালন করেন সাঁওতালেরা। সাঁওতালদের নিজস্ব পঞ্চায়েত-ব্যবস্থায় সদস্য পরিবর্তনের সময় 'মাঘ-সিম' পরব উদ্‌যাপিত হয়। আদিবাসীদের অন্যতম আচার শিকার-উৎসব। শিকারের যাওয়ার আগে আদিবাসী পুরুষেরা তাঁদের স্ত্রীর হাতের নোয়া খুলে নিয়ে যান। এর পরে 'বুল-মায়াম' ও 'দিহুরি'-র মধ্য দিয়ে বিপদ মুক্তির সংকেত পেলে শিকারিরা জঙ্গলে প্রবেশ করেন। শিকারের পর গ্রামে ফিরে এসে নাচ-গানের উৎসবে মেতে ওঠেন। সারহুল, কারাম, গরাম, বড়াম, গেরাম প্রভৃতি পুজো ও ধর্মীয় আচার টাঙন-অববাহিকার আদিবাসীদের নিজস্ব সম্পদ।[৩]

মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব :

ইদুলফিতর, ইদুজ্জোহা, মহরম, সবেবরাত প্রভৃতি পার্বণ এ অঞ্চলের মুসলমানেরা পালন করে থাকেন। অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের মতোই এখানকার মুসলমানদের তিনটি প্রথা অবশ্য পালনীয়:

(১) ইমান : ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস।

(২) নমাজ : পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়া উচিত। পাঁচ বারের নমাজের পাঁচটি ভিন্ন নাম আছে। সূর্যোদয়ের আগের নমাজকে 'ফজর', দুপুরের পরের নমাজকে 'জোহর', বিকেলের নমাজকে 'আসর', সূর্যাস্তের পরের নমাজকে 'মাগরিব' ও রাতের নমাজকে 'এষা' বলা হয়।

(৩) রোজা : হিজরি সন অনুযায়ী বছরের নবম মাস রমজান। এই মাসে দিবাভাগে পানাহার থেকে মুসলমানেরা বিরত থাকেন। আজকাল অনেক জায়গায় সান্ধ্য ইফতারে সমবেত ভাবে যোগ দেওয়ার চল শুরু হয়েছে।

নতুন চাঁদ দেখে ইদের আনন্দে মেতে ওঠেন মুসলমানেরা। অধুনা অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিবেশীদেরও এই পার্বণে শামিল হতে দেখা যাচ্ছে। ইদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। ইদুজ্জোহা বা কুরবানিতে অনেক মুসলমান অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাগ-মাংস বিতরণ করেন। সবেবরাতে কেউ কেউ আলোকসজ্জা ও কোরান পাঠের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখেন। তবে টাঙন-তীরের এলাকায় মহরমের উৎসবে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি হয়। হবিবপুর, গাজোল, পুরাতন মালদহ ও বামনগোলার বিভিন্ন গ্রামে মহরমের নিজস্ব মাঠ আছে। মহরমের মিছিলে ছোটো-বড় সবাই অংশ নেন। মহরমের লাঠি খেলা দেখতে সব সম্প্রদায়ের মানুষই ভিড় করেন। যানবাহন থামিয়ে মহরমের জন্য চাঁদা আদায় করার চল শুরু হয়েছে।

ধনী মুসলমানদের জাকাত (দান) ও হজযাত্রায় শামিল হওয়া অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। কেউ কেউ এই কর্তব্য পালন করেন। তবে এই এলাকায় ফতেহা-দোয়াজ-দাহম ও ফতেহা-ইয়াজ-দাহম তেমন ভাবে পালিত হয় না।

উৎসগত কারণে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বরিন্দ এলাকার মুসলমানদের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলে আসা সম্প্রদায়গত ধর্মীয় আচার এখনও প্রভাব বিস্ত ার করে আছে। রাজবংশি সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত মুসলমানেরা বিয়ের সময় মৌলবিকে দিয়ে কলমা পড়ালেও বাইশকাণ্ডি, কলাগাছ পোঁতা, রাতে বিয়ে প্রভৃতি আচার পালন করেন। টাঙন-অববাহিকার অনেক মুসলমান-পরিবারে গো-মাংস নিষিদ্ধ। শেরশাহি-বাদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় আচারের কঠোরতা বেশি।

খ্রিস্ট ধর্মীয় উৎসব :

এ এলাকায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা নবীন। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে বিভিন্ন মিশনারি কার্যকলাপের ফলে তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে। অন্যান্য সম্প্রদায়েরও কিছু মানুষ খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। কেউ কেউ আর্থিক সুবিধে পাওয়ার প্রত্যাশাতে এই ধর্মান্ত রকরণের পথ বেছে নিয়েছেন।

মূলত বড়দিনের উৎসব ও রবিবারে গির্জায় যাওয়া ছাড়া আর কোনও ধর্মীয় আচারে শামিল হতে এখানকার খ্রিস্টানদের দেখা যায় না। বরং তাঁদের সদ্য ছেড়ে-আসা আচার- অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই আগ্রহ দেখান। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁদের অধিকাংশই নির্দ্বিধায় অংশ নেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার :

খুব কম সংখ্যক হলেও টাঙন-অববাহিকা এলাকায় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে গাজোলের রাইখানদিঘির তীরে এসেছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত।[৪] শিখগুরু নানক পুরাতন মালদহে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। ১৪৬৮-'৬৯ খ্রিস্টাব্দে এখানকার একটি গুরুদ্বারে তিনি অবস্থান করেন। তাঁর ব্যবহৃত উপকরণগুলি এই গুরুদ্বারে সংরক্ষিত আছে। এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য দুটি গুরুদ্বার আছে। গুরু নানকের জন্মদিনে প্রতিবেশী রাজ্যের শিখরাও গুরুদ্বার-দুটিতে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করেন।

এখানকার মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কখনও কখনও বাইরে থেকে দিগম্বর সাধুরা এসে এঁদের ধর্মীয় উপদেশ দেন। গাজোল ও পুরাতন মালদহে জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়োয়ারির সংখ্যা বেশি।

বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও পুজোপার্বণে মেতে উঠলেও একটা ধর্মীয় সমন্বয়ের সুর টাঙনের মতোই এই এলাকায় স্রোতস্বী।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ পৃষ্ঠা-১৭৭

২. সেমিনার নিবন্ধাবলী : বাংলার লৌকিক অভিকরণ শিল্পকলা ও লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনাচক্র, ফেব্রু. ২০০৮, ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোশিয়েশ্যান অব ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা-১৩৯

৩. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ পৃষ্ঠা- ১৮৬-১৯০

৪. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা- ৯১